Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.32-39
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দুর্ভিক্ষ : আদিবাসী সমাজের পশ্চাদপদতার একটি কারণ

সাথী মন্ডল
পি এইচ ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

*Famine was frequently reported in various parts of India during the British period. Bankura was one of the places in West Bengal where famine was frequent. In fact, the environment of Bankura is always dry and water crisis is seen at other times except monsoon season. Normally agriculture is also disrupted due to lack of water. Due to the lack of water, famine was seen here frequently. Due to repeated famines in Bankura, people of all classes fell into misery. But the plight of the indigenous people in the famine was much greater. Because their only source of income was agriculture and the lack of improvement in the irrigation system would have hampered agriculture due to drought. As a result, grain loss was inevitable. As a result, it became very difficult for the indigenous people to cope with the famine. Because, their employment would also be cut off due to famine. As a result, it was not possible for them to buy food grains. Famine aslo made their lives miserable due to various reasons. Indigenous peoples were most affected by the famine of 1865-66 in Bankura, which was called '**Bahattorer Durviksya**' (famine of 1272 in bengali calendar). During this time they were forced to sell their land and move to neighboring districts in search of work. They were forced to engage in anti-social activities such as theft and robbery as the British government did not provide adequate relief to them. Also many people died of starvation, just as they were forced to emigrate. The misery caused by the famine depopulated the indigenous villages and it also hindered their social and thinking development. Which caused misery among them and for a long time they were away from the mainstream of society. In other words, famine can be considered as one of the reasons for their backwardness.*

Keywords: Bankura District, Famine, Indigenous Communities, 'Bahattorer Durviksya', Immigration.

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। দুর্ভিক্ষ ছিল বাৎসরিক ঘটনা। ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘটত। আর বাঁকুড়া খুব ছোট একটি অঞ্চল হলেও সেখানে তো দুর্ভিক্ষ ছিল জেলাবাসীর নিত্য সঙ্গী। এমনিতেই বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি রুক্ষ-শুষ্ক হওয়ার জন্য জেলার সর্বত্র কৃষির উপযোগী নয় তাই এখানে উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হলেই দুর্ভিক্ষ দেখা যেত। বাঁকুড়াতে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ হত বলেই

সরকারিভাবে এই জেলাকে খরাপ্রবন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হত। সাধারণ ছোট ছোট দুর্ভিক্ষ গুলির পাশাপাশি মারাত্মক দুর্ভিক্ষও বাঁকুড়াবাসীর জীবন বারবার সংকটময় করে তুলত। যেমন --- ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ আদিবাসীদের অবস্থা করে তুলেছিল সংকটময়। এছাড়া ১৮৯৭ সালের মারাত্মক দুর্ভিক্ষে বাঁকুড়ার শতকরা ৪০ ভাগ লোক আক্রান্ত হয়েছিল।[১] তবে দুর্ভিক্ষের কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ছিল না। এর সাথে মনুষ্যকৃত কারণও ছিল। কারন তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের উদাসীনতা দুর্ভিক্ষকে আরও ভয়ংকর রূপ দিত। বাঁকুড়াতে নানা কারণে শস্যহানি ঘটত, যেমন --- কম বৃষ্টিপাত, বন্যা, কীটপতঙ্গের উৎপাত প্রভৃতি। কিন্তু দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য সরকারের ঔদাসীন্য ছিল প্রবল। পরিস্থিতি খুব ভয়ংকর না হলে সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করত না আবার অনেক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও তা ঘোষণাই করা হত না। আর বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ফল বারবার ভোগ করতে হয়েছে বাঁকুড়াবাসীদের। এতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষ ও আদিবাসী সম্প্রদায়। হয় তাদের জীবন ধারণের জন্য নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্ব হতে হয়েছে, আর না হলে অর্ধাহারে, অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে অসহায়ভাবে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অভিবাসন। নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য অনেকেই পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আদিবাসীদের জীবিকা কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার জন্য তাদের জীবনেই সবথেকে বেশি বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ (যা বাহাত্তরের দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত) আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ম্যালি, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ ও মানুষের দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।

বাঁকুড়া এমনিতেই কম বৃষ্টিপাতপ্রবণ অঞ্চল। তাই অনাবৃষ্টি এখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। আর অনাবৃষ্টি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্যাভাব দেখা যেত। ফলে মানুষের অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠত। বাঁকুড়াতে বরাবর দুর্ভিক্ষ হওয়ার জন্য এই জেলা খরা ও দুর্ভিক্ষপ্রবণ জেলা হিসেবে পরিচিত ছিল। অবশ্য এই অবস্থার জন্য জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও গঠনও দায়ী। কারণ বাঁকুড়া ভৌগোলিক দিক থেকে গ্রীষ্মমন্ডলের অন্তর্গত।[২] আর কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সেই অঞ্চলের সব বিষয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে। ভৌগোলিক দিক থেকে বাঁকুড়ার অবস্থান ২২°৩৮' থেকে ২৩°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৩৬' থেকে ৮৭°৪৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঁকুড়ায় তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য জলের অভাব দেখা যায়। আবার ভূত্বকের গঠনের জন্য জল মাটির নীচে জমা হতে পারে না ও জমা জলও শীঘ্র শুকিয়ে যায়। ফলে এখানে ভীষণ জলকষ্ট দেখা দেয়। আর সেচের জলের অভাবের জন্য কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটে। অর্থাৎ জলকে কেন্দ্র করেই বাঁকুড়ার বুকে বারবার ঘটেছে খরা, অজন্মা, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ । যার ফলে বাঁকুড়াবাসীদেরও বারবার চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

বাঁকুড়ার ইতিহাস দেখলে দেখা যায় কিছু অংশ বাদ দিলে এখানকার অধিকাংশ স্থানেই জলের অভাব। অধিকাংশ স্থানের অনুর্বর মৃত্তিকা ও সেচের জলের অভাবের জন্যই এখানকার বেশিরভাগ জমি পতিত থাকত। খুব কম পরিমাণ জমিতেই কৃষিকাজ হত। ১৯১৭-২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলার মোট ৪৭ ভাগ জমি কৃষির আওতাভুক্ত ও এর মধ্যে ৯০ শতাংশ ছিল এক ফসলী ধান জমি।[৩] অর্থাৎ এখানকার প্রধান ফসল ধান এবং এই জেলার বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল। তাই উৎপাদনে সামান্য গরমিল হলেই এখানে খাদ্যাভাব নিশ্চিত হয়ে পড়ত। আর তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে পরিস্থিতিকে আরও ভয়ংকর করে তুলত। যার

ফলে বহু মানুষকে অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে হত ।পল গ্রীণোর 'আধুনিক বাংলার সমৃদ্ধি ও দারিদ্র : দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪' গ্রন্থ থেকে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবর্গের একটি পরিবারের দুর্ভিক্ষে শোচনীয় দুরবস্থার একটি বিবরন পাওয়া যায়।[৪] এটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি থেকে প্রাপ্ত। যেখানে জানা যায় যে সেই পরিবারের লোকজন বর্ণকৌলীন্যের ও সামাজিক মর্যাদার কারণে ভিক্ষাবৃত্তিও গ্রহণ করতে পারেনি আবার চরম অর্থ সংকটের কারণে অনাহারে থাকতেও বাধ্য হচ্ছিলেন। তাই পরিবারকে বাঁচানোর জন্য জনৈক ব্যক্তিটি গোপন সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় যে দুর্ভিক্ষে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অবস্থাই যদি এতটা করুণ হত তাহলে দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের অবস্থা আরও কতটা করুণ হতে পারে।

দেখা যায় এই জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব বরাবরই ছিল এবং ব্রিটিশ সময়কাল থেকেই সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যও পাওয়া যায়। ১৮৪৪ সাল থেকেই এই জেলার খরাজনিত শস্যহানির ফলে যে বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সময়কাল গুলি হল - ১৮৪৪, ১৮৫১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭-৯৮, ১৯০৮, ১৯১৯-২১, ১৯২৫, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩৩, ১৯৩৭, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ ।[৫] এই দুর্ভিক্ষগুলি বাঁকুড়ার জনমানসে কম বেশি ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ১৮৬৫ সালের অনাবৃষ্টির কারণে হওয়া শীতকালীন শস্যহানি ১৮৬৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল, যার প্রভাব বাঁকুড়ার উত্তর পূর্ব দিকে মোটামুটি ভাবে পড়লেও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সবথেকে বেশি পড়েছিল। আর এর শিকার হয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। বাঁকুড়াতে এত বেশি দুর্ভিক্ষ কেন হত তার কারণগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর দ্বারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুর্গতির কারণও বোঝা যায়। ব্যাখ্যা গুলি নিম্নরূপ -----

১. বাঁকুড়াতে এমনিতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। আর বর্ষার সময় পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিলে জল জমলেও অন্য সময় তেমন জল জমা থাকে না। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হয়নি। ফলে অনাবৃষ্টির সময় সেচের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় কৃষিকাজে বাধার সৃষ্টি হত। যার ফলে শস্যহানিও ছিল অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাতে জমি বা উদ্বৃত্ত খুব বেশি না থাকার ফলে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা তাদের কাছে কঠিন বিষয় ছিল।

২. আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল অথবা কৃষি মজুরের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। অর্থাৎ অন্যান্য মানুষদের মতো আদিবাসীদেরও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সুযোগ ছিল কৃষি। অনাবৃষ্টিতে কৃষিতে বাধার সৃষ্টি হলে তাদেরও কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে যেত। ফলে আয়ের উৎস না থাকায় তাদের ক্রয়ক্ষমতাও নষ্ট হত। খাদ্য সংগ্রহের অন্য সুযোগ না থাকায় তাদের অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে হত।

৩. বাঁকুড়া থেকে খাদ্যশস্যের রপ্তানিকেও দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়। রেলপথের সূচনা বাঁকুড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করেছিল। অন্যদিকে তৎকালীন জেলা কালেকটর কেরলিস্কলি বলেছিলেন যে দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাঁকুড়া জেলায় চালের দাম ছিল অপেক্ষাকৃত কম।[৬] ফলে দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষের সময়ও রপ্তানি বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ এখানে রেলপথ স্থাপনের ভালো ও খারাপ উভয়দিকই ছিল। হান্টারের লেখা থেকে জানা যায় যে খাদ্যশস্য রপ্তানি করে শস্য ব্যবসায়ীগন যথেষ্ট অর্থের মালিক হয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে হান্টার বলেছেন "In ordinary years Bankura exports small quantities of rice to Hugli and Midnapore. In 1865 these exports were much

larger than usual, on account of the deficiency of crop in Midnapore and Manbhum''[৭] অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময়ও রপ্তানিতে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে যেখানে রেলপথে বাঁকুড়া থেকে ৪,৩৬১ মন চাল ও ১,২২৬ মন ধান রপ্তানি করা হয়েছিল, ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে সেখানে ৪৮,৯১৮ মন চাল ও ৫,২৮০ ধান রপ্তানি করা হয়েছিল এবং মে মাসে রপ্তানি করা হয়েছিল ৯১,২৭২ মন চাল ও ৩৮,৭১২ মন ধান।[৮] ফলে বোঝাই যায় যে বাঁকুড়াতে শস্যের অপ্রাপ্তির জন্য বিপুল পরিমাণে শস্য রপ্তানিই দায়ী ছিল।

৪. দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হলেও মহাজনদের শোষণ প্রবৃত্তি, শস্য ব্যবসায়ীগণের মুনাফা লাভের চেষ্টা, সরকারের অনীহা, ত্রাণকার্যে অবহেলা, আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনা দুর্ভিক্ষকে আরও ভয়ংকর রূপ দিত। কখনো হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ত্রাণ শিবির খোলা হত আবার কখনো ত্রাণ সাহায্য অনেক দেরিতে এসে পৌঁছাত। যার ফলও হত ভয়ংকর। যেমন --- বাহাত্তরের মন্বন্তর সাঁওতাল - ভূমিজ-বাউরি অধ্যুষিত ও তৎকালীন মানভূম জেলা সন্নিহিত জঙ্গলাকীর্ণ পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু ত্রাণশিবির খোলা হয়েছিল মাত্র চারটি; যেমন, বাঁকুড়া শহরে, শহরের তিন মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে, বিষ্ণুপুর শহরে ও গঙ্গাজলঘাটিতে।[৯] এর ফলে ঐ অঞ্চলের বহু মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিল, আবার অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া মহাজনদের শোষণ প্রবৃত্তির জন্য সাঁওতালদের জমি হস্তান্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল যা তাদের আরও দরিদ্র করে তুলেছিল। বিভিন্ন ফেমিন রিপোর্টে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়া জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। তবে নিম্নবর্গের ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থা ছিল সবথেকে শোচনীয়। গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ত কখনো অনাহারে মৃত্যুর কারণে আবার কখনো গ্রাম ছেড়ে সেখানকার মানুষদের অন্যত্র চলে যাওয়ার কারণে। বাঁকুড়াতে কৃষিকাজে মূলত খয়রা, বাউরী, বাগদী, সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্নবর্গের ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যুক্ত থাকত। ম্যাক আলপিন লিখেছেন যে ১৮৬৫-৬৬ সালের বাহাত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতাল জমিচ্যুতির ঘটনা শুরু হয়েছিল ও পরবর্তীকালে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসময় বাঁকুড়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দিখু মহাজনদের কাছে সাঁওতালদের সবথেকে ভালো জমি খুব কম দামে বিক্রি হওয়ার কথাও জানা যায়। কারণ দুর্ভিক্ষে দরিদ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের দারিদ্র অনেক বেশি বৃদ্ধি পেত এবং ব্রিটিশ সরকারের আয়োজিত ত্রাণশিবির তার উপশম ঘটাতে না পারলে বাধ্য হয়ে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচানোর জন্য তারা নিজেদের জমিটুকু বন্ধক দিতে বা বিক্রি করতে বাধ্য হত। একজন ভূমি মালিকের জবানবন্দি অনুযায়ী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০ বিঘারও বেশি সাঁওতালী জমি তার দখলে এসেছিল এবং তার মধ্যে ৮০ বিঘা জমি খাস করা হয়েছিল।[১০] ম্যাক আলপিন আরও বলেছিলেন যে "In fact, I am not at all sure that the proper number is not 200 bighas, but his jamabandis require explanation, and I give the smaller number''.[১১] দেখা যায় ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী সময়েও কৃষিজীবী সাঁওতাল, খয়রা, ভূমিজ, বাগদী, বাউরী সম্প্রদায়ের মানুষদের হাতে কিছু অনুর্বর টাঁড় ধরনের কৃষিজমি ছিল।[১২] কিন্তু ক্রমশ জমি হস্তান্তরের ফলে তারা প্রায় ভূমিহীন হতে থাকে। খাতড়া ও রাইপুর থানায় সাঁওতালদের বসবাস বেশি থাকায় দেখা যায় এইসব অঞ্চলেই জমি হস্তান্তরের বেশি ঘটনা ঘটেছিল এবং অন্যান্য জাতির ভূমিহীন কৃষকদের মতো জমিচ্যুত সাঁওতালরাও নিজের জমিতে সাজা প্রথায় চাষ

করতে বাধ্য হয়েছিল। ম্যাক আলপিন শুনেছিলেন যে সাঁওতাল গ্রামপ্রধানকে দুই পয়সার খাদ্যশস্য ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে মহাজন সমস্ত গ্রামের মালিকানা গ্রাস করে নিয়েছিল।[১৩] সুদীপ্ত পোড়েল ম্যাক আলপিনের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে শ্যামসুন্দরপুরে ১৮৯২ সালে সাঁওতাল মাঝির আওতাধীনে ১৪ টি গ্রাম ছিল, যা ১৯৯০ সালে কমে দাঁড়িয়েছিল ১০ টিতে এবং রাইপুরে ১৮৮৪ সালে এমন গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৯ টি, যা ১৯০৪ সালে মাত্র ২ টিতে দাঁড়িয়েছিল।[১৪] এই মহাজনী ঋণে সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশি এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করায় নিম্নবর্গের মানুষ ও সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সেই ঋণে একবার জড়িয়ে পড়লে সেই জাল থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারতো না। এই সব সম্প্রদায় এই মহাজনী ঋণের জন্যই বেশি জমিহারা হত। ম্যাক আলপিনের লেখায় সাঁওতাল জীবনে মহাজনী শোষণের ভয়ংকর চিত্র পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষে জমির হস্তচ্যুতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর সাথে চরম অর্থাভাব তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে নষ্ট করেছিল। দুর্ভিক্ষের পূর্বের বছরগুলিতে একদিকে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হত অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস না পেয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার অজন্মার কারণে চালের দামও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে মানুষের অবস্থা চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়। তবে চালের দাম বৃদ্ধির অন্য কারণও ছিল আর এক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেছিল শস্য ব্যবসায়ীগণ। বাঁকুড়া থেকে ভালো মানের চাল রপ্তানি করে নিম্নমানের কাঁকরযুক্ত চাল দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে আমদানি করা হত। দেখা যায় ১৮৬৬ সালের জুলাই মাসে বাঁকুড়া বাজার থেকে চাল নিরুদ্দেশ হওয়ার জন্য কলকাতা থেকে চাল আমদানি করতে হয়েছিল। আবার ব্যবসায়ীগণ অধিক লাভের আশায় খাদ্যশস্য গুদামজাত করে পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে সাহায্য করত। ফলে সাধারণ মানুষ খাদ্যশস্য ক্রয় করতে না পেরে অনেক সময় বনের মহুয়া খেয়ে খিদে মেটানোর চেষ্টা করত। এছাড়া অনেক মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতেও বাধ্য হত, যার পরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হত মৃত্যু। ও. ম্যালি লিখেছিলেন "Prices had been high in 1865, and exports had been unusually heavy, for those who ordinarily kept stocks for their consumption through the coming year were tempted by the high rates to sell off what they had".[১৫] খাদ্যশস্যের অপ্রাপ্তি, অর্থের অভাব, জমির হস্তচ্যুতি চুরি ডাকাতির ঘটনাকে বৃদ্ধি করেছিল। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে ত্রাণের বিশেষ ব্যবস্থা সরকার না করায় এবং মানুষ বেঁচে থাকার উপায় না পেয়েই চুরি ডাকাতি করতে বাধ্য হয়েছিল। ম্যালির লেখা থেকে জানা যায় যে চুরির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। "The property stolen consisted of nothing but food and any valuable found in the house were left by the dacoits as useless"[১৬]

অর্থাভাব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের গৃহহীনও করেছিল। কারণ খাদ্যের অভাবে মানুষ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছিল ।নিজের ও পরিবারের ভরনপোষণের কারণেই এই অভিবাসন ঘটেছিল। দেখা যায় সাঁওতাল আদিবাসীদের অনেকেই কাছাড় ও আসামেও কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছিল । বিভিন্ন গানের মধ্যেও তাদের আসাম যাওয়ার ও সেখানের দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যালির লেখা থেকেও জানা যায় যে কিছু মানুষ রানিগঞ্জের ওপারে পূর্ব ভারতীয় রেলপথের কর্ড লাইনে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্যও গিয়েছিল। ফলে বাঁকুড়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকের অনেক গ্রাম প্রায় জনশূণ্য হয়ে পড়েছিল।

তবে শুধু ১৮৬৬ সালেই নয় ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে এই জেলার অন্যান্য স্থানের সাথে সাথে রাইপুর থানা, সিমলাপাল ফাঁড়ি এলাকাও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। ১৮৯৫-৯৬ সালের বৃষ্টির অভাবে প্রধান শীতকালীন ফসল নষ্ট হলে ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সঠিক সময়ে ব্রিটিশ সরকার ত্রাণকার্য শুরু না করায় দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন করে তোলে। এছাড়া ১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষ রাইপুর থানার দুই -তৃতীয়াংশ, খাতড়া থানার প্রায় অর্ধেকাংশ, সিমলাপাল ফাঁড়ি এলাকার অনেকাংশ ও তালডাংরা ফাঁড়ি এলাকার প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চলকে গ্রাস করেছিল।[১৭] কিন্তু তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হত খুবই সীমিত। সব সময় যেমন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সমগ্র অঞ্চলকে ত্রাণ ব্যবস্থার আওতায় আনা হত না, তেমনি সকল মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রীও পেত না। যা তাদের অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে ও অভিবাসনে যেমন বাধ্য করত, তেমনি মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিত। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হলে তবেই সীমিত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করত ব্রিটিশ সরকার। ফলে অনেক সময় বেসরকারিভাবেও ত্রাণের ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে সব মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন কিছু ক্ষেত্রে তারা নিজেদের খেতাব লাভের জন্যই অন্নসত্রের ব্যবস্থা করতেন। তবে সে যা হোক না কেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিল কর্মনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা। ফলে তারা টেস্ট রিলিফের মতো কষ্টসাধ্য কাজ করতেও সম্মত হত কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুদান গ্রহণে তারা আগ্রহী ছিল না। অর্থাৎ কাজের সুযোগ থাকলে তারা কাজ করে উপার্জন করার চেষ্টা করত। এছাড়াও দুর্ভিক্ষের সময়ও তারা জাতপাতের সংস্কার আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। ফলে ১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে রাইপুর থানায় দুটি ছাড়া অন্য সব দরিদ্র নিবাস তুলে দিয়ে খয়রাতি সাহায্যের স্থলে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে চাল বিতরন করা হত, যার পরিমাণ ছিল --- বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ১০ ছটাক, স্ত্রীলোকদের জন্য মাথাপিছু ৮ ছটাক ও ১৪ বছরের কম বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক।[১৮]

অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়ার মানুষদের কাছে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এতে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য মানুষদের শোষণ করে লাভবান হয়েছিল। তবে বেশিরভাগ মানুষ হয়েছিল দুর্দশাগ্রস্থ। আর সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শ্রমজীবী নিম্নবর্গের ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল আর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি করেছিল বাঁকুড়া শহর ও শহর লাগোয়া মাত্র চারটি স্থানে ত্রাণ শিবিরের আয়োজন করে। জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ত্রাণের ব্যবস্থা না করায় সেখানকার মানুষ সাহায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং ভূমিহীন হতে ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ম্যাক আলপিনের মতে বাহাত্তরের দুর্ভিক্ষ ছিল বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের আর্থসামাজিক জীবনের একটি দিকচিহ্ন।[১৯] এইসময় বহু মানুষ নিজের চাষের জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ১৯৩৫ সালের বেঙ্গল বোর্ড এনকোয়ারি রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে বাঁকুড়া জেলার হতদরিদ্র সাঁওতালরা তাদের সবথেকে উর্বর জমিগুলি জোতদারদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।[২০] সুতরাং বলা যায় দুর্ভিক্ষকালীন শোষণ, বঞ্চনা, সরকারের অবহেলা, ও ঔদাসীন্য সাঁওতাল সমাজকে মারাত্মক দুরবস্থার সম্মুখীন করেছিল। আদিবাসী গ্রামগুলিকে করে তুলেছিল জনমানবশূন্য এবং আদিবাসী জনজীবনকে করেছিল বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ।

দুর্ভিক্ষের এই প্রভাব ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব আদিবাসীদের জীবনের উপর পড়েছিল। বারবার বাঁকুড়ার বুকে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষ আদিবাসীদের আজকের অবস্থার জন্য কিছুটা হলেও দায়ী নয়কি? আজ আমরা তাদের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু এর কারণ কি শুধুমাত্র তাদের নিজেদেরকে নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখা, নাকি আরও কিছু? আমার মনে হয় দুর্ভিক্ষও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ দুর্ভিক্ষ সরলপ্রাণ নিম্নবর্গের বিশেষত আদিবাসীদের সামাজিক ও মননের বিকাশকে ব্যাহত করেছে। বাঁকুড়ার বুকে বারবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তারাও বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ তাদের আত্মপ্রত্যয়কে আঘাত করেছে। তাদের স্বাস্থ্য, চিন্তা, চেতনার অগ্রগতিকে বাধা দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে আসার থেকে ব্যাহত করেছে। দুর্ভিক্ষ তাদের মধ্যে দৈন্যভাব তৈরি করেছিল, যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যার ফলে তাদের মধ্যে যেমন শিক্ষার আলো তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, তেমনি তৈরি হয়েছিল অসহায়তা। হয়ত এই অসহায়তার কারণেই দিখুদের অন্যায় অত্যাচার তারা মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের হয়ত মনে হয়েছিল যে তাদের প্রতিবাদ তাদেরকে আরও দৈন্য ও অসহায় করে তুলতে পারে। অর্থনৈতিক বিকাশ না হওয়ায় তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তেমনভাবে হয়নি। যার ফলে আজও তারা শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের মতো এগিয়ে আসতে পারেনি। দৈন্যভাব তাদের স্বাস্থ্য চেতনা ও শিক্ষার ঘাটতি তাদের চিন্তা চেতনাকে দুর্বল করে তুলেছিল। যার ফলে সবক্ষেত্রেই তারা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষকে আদিবাসীদের পশ্চাদপদতার, সমাজের মূল স্রোতে দীর্ঘদিন না আসার একটি কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র:

১. *পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা,* পশ্চিমবঙ্গ তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০৯, পৃ. ৩১৬।
২. হিমাংশু ঘোষ, *বাঁকুড়ায় খরা, সমাজ ও রাজনীতি,* প্রথম বর্ষ শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৮, পৃ. ১০৪।
৩. ড. বিশ্বরূপ গোস্বামী, *প্রসঙ্গ : রাঢ় ও অন্যান্য বিষয় (সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস-রাজনীতি*), সদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ৪৬।
৪. পল গ্রীনো, *আধুনিক বাংলার সমৃদ্ধি ও দারিদ্র : দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪,* কে. পি. বাগচী, পৃ. ১৪৮-৪৯।
৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি,* পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া, ২৬ শে জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৬৪।
৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৬৫।
৭. W. W Hunter, *Statistical Account of Bengal,* p. 271.
৮. ড. বিশ্বরূপ গোস্বামী, ঐ, পৃ. ৫১।
৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৮১।
১০. M. C. Mcalpin, *Condition of the Sonthals,* Firma Mukhopadhyay, Calcutta, 1981, p. 29.
১১. ম্যাক আলপিন, ঐ, পৃ. ২৯।
১২. রঞ্জন কুমার মন্ডল; 'বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ ও অনটন : কৃষক সম্প্রদায় (১৯১৯-১৯৪৩)' ; সঞ্জয় মুখার্জি (সম্পাদক)*, Jungle Muhal Continuity and Change,* প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, মে ২০১৩, পৃ. ২৫৫।
১৩. ম্যাক আলপিন, ঐ, পৃ. ১০।

১৪. সুদীপ্ত পোড়েল, *অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি (প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব)*, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৮৬।
১৫. L. S. S. ও. Malley, *Bengal District Gazetteer: Bankura*, Calcutta, 1908, p. 108.
১৬. ও. ম্যালি, ঐ, পৃ. ১০৮-১০৯।
১৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৬৯।
১৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩৭৬।
১৯. ম্যাক আলপিন, ঐ, পৃ. ১০।
২০. শুচিব্রত সেন, *পূর্ব ভারতে আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭৪।